এই সময়

* কথাসরিৎ *

আজকালকার দিনে আমাদের প্রত্যেককেই দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছে বণিকরাজকে, তা থেকে কারো মুক্তি নেই।
—বুদ্ধদেব বসু

সংকট

তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক ভাবধারার জয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে দীর্ঘকাল চর্চিত হবে। প্রেসিডেন্ট রেসেপ তয়িপ এর্দোয়ানের সমালোচকের অভাব নেই সে দেশে। কিছুকাল আগেই তাঁর নানা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পথে নেমেছিলেন তুরস্কবাসী, তা সত্ত্বেও দেশের সেনাবাহিনীর একাংশ যখন গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে অস্ত্রবলে উৎখাত করার পরিকল্পনা কারে, তা ভেস্তে দিতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেন দেশের নাগরিকরা তা যত না সরকারের প্রতি জনসমর্থনের প্রমাণ, তার থেকেও বেশি শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থার প্রতীক। সেই প্রক্রিয়ায় প্রাণ দিয়েছেন শতাধিক মানুষ। সর্বার্থেই তাঁরা গণতন্ত্রের শহিদ। আশার বিষয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এরদোয়ানের বিরোধী হিসেবে পরিচিত দেশগুলিও এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে স্পষ্ট করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সমাজেও গণতন্ত্রের কোনও গ্রহণযোগ্য বিকল্প নেই। অব্যবহিত বিপদের মেঘ কেটে গিয়েছে, এখন তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সামনে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রের মৌলিক বার্তাটি অনুধাবন করে সমগ্র দেশে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা।

এইখানেই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর্দোয়ান যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূলে কুঠারাঘাতে উদ্যত সেনানেতৃত্ব এবং তাঁদের সমর্থকদের দেশের আইন অনুযায়ী বিচার অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তা যেন কোনও ভাবেই যাবতীয় রাজনৈতিক বিরোধিতা নির্মূল করার প্রক্রিয়ায় পরিণত না হয়, এরদোয়ানকে তা সুনিশ্চিত করতেই হবে। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কিছু কিছু মন্তব্যে এ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়, গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬০০০ মানুষ। তুরস্কে ফের মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনতে এরদোয়ান যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ২০০৪ সালে তুরস্কের দণ্ডবিধি থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়। দেশ থেকে 'সমস্ত জীবাণু নির্মূল' করার স্লোগান তুলে ১২ বছর আগের সেই প্রগতিমুখী সিদ্ধান্ত উলটে দেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পদক্ষেপ হবে। রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিসর গণতন্ত্রের প্রাথমিক অপরিহার্য অঙ্গ। এরদোয়ান দেশজুড়ে যে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, রাজনৈতিক বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করে সে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এই অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা জনসমাজে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, প্রতিহিংসাপরায়ণতা নয়, গভীর সহানুভূতি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতাই একমাত্র সে ক্ষতের প্রলেপ হতে পারে।

কৃত্রিম

প্রাচীন কাল থেকে প্রকৃতির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রকৃতিকে একটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে কল্পনা করেছে মানবপ্রজাতি। সেই 'পৃথক অস্তিত্ব'টিকে ব্যবহার করেই সভ্যতার উন্নয়ন প্রকল্পে সামিল সে। তাতে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্ভবত একটি মৌলিক বিস্মরণও ঘটেছে, যে মানবপ্রজাতি আসলে প্রকৃতিরই অংশ। আলো মানবশরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অর্থাৎ আলো-অন্ধকার তথা দিন-রাতের যে প্রাকৃতিক বৃত্তটির মধ্যে মানবপ্রজাতির অবস্থান, জীবন যাপনের ধারাটিকে যদি সেই বৃত্তের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তবে সমস্যা হয়তো বাড়ে বই কমে না। বিদ্যুতের সাহায্যে হয়তো দিনের সারাক্ষণই আলোর মধ্যে থাকা সম্ভব, তাতে কাজের সুবিধা হয়,

গত এক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে গরিব মানুষদের মধ্যে বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা কমেছে, তৃণমূলের বেড়েছে

বামেরাই বামপন্থায় নেই, জোটের কী দোষ?

কংগ্রেসের হাত ধরেই বামফ্রন্ট ডুবছে নাকি সঠিক রাজনীতি না করার ফলেই তাদের একের পর এক ভরাডুবি? লিখছেন

মইদুল ইসলাম

অজিত নাইনন

সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের অন্দরে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আসন সমঝোতা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের হাত ধরেই কি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ডুবছে নাকি সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট তার নিজের রাজনীতি না করার ফলেই গত আট বছরে একের পর এক নির্বাচনী ভরাডুবি হচ্ছে? এই বিষয়ে গত এক দশকের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী গতিপ্রকৃতির যথাসম্ভব এক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৪২টির মধ্যে ৩৫ আসন আর ভোট পেয়েছিল ৫০.৮%। তৃণমূল, এনডিএর জোটসঙ্গী হিসেবে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মাত্র একটা আসন পেয়েছিল (একমাত্র বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছিলেন)। বামেরা কেরালা থেকে কুড়ির মধ্যে দুই নির্দল সহ সতেরো আসন পেল, ত্রিপুরায় দুইয়ের মধ্যে দুই, ঝাড়খণ্ডে একটা, তামিলনাড়ু-তে চারটে আর অন্ধ্রপ্রদেশে দুটো। সব মিলিয়ে ৬১টি আসন পেল। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু-তে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা হয়েছিল। কেন্দ্রে এনডিএ সরকার চলে গেল। প্রথম ইউপিএ সরকার গঠিত হল। বামেরা সেই প্রথম ইউপিএ সরকারকে একটি নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল।

দিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ (সিএসডিএস)- এর ভোট পরবর্তী সমীক্ষা অনুযায়ী বামফ্রন্ট ২০০৬ সালের নির্বাচনেই ৫% গ্রামের গরিব মানুষের ভোট কম পেয়েছিল অথচ তারা শহরের ধনী মানুষের মধ্যে ১৮% ও শহুরে মধ্যবিত্তর মধ্যে ১৬% সমর্থন বেশি পেয়েছিল ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায়। অর্থাৎ ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ আসন পেলেও তার শ্রেণি অভিমুখ ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে বামফ্রন্টের জেতা নির্বাচনগুলোর থেকে আলাদা ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে যে 'আমরা ২৩৫ আর ওরা ৩০' এর অহমিকা প্রদর্শন একটা বি-রাজনৈতিক বালখিল্য অভিব্যক্তি ছিল। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট যখন ২৫১ আসন পায় আর প্রায় ৫২% ভোট পায়, তখন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব বা রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও রকম কিছু কথা বলতে যাননি। ২০০৬ সালে শহর ও গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিকে একত্র করে সিএসডিএস যাদের 'গরিব' মানুষ বলছে তাদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থনের হার ছিল ৫৫%। অন্য দিকে রাজ্যের ধনীদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থনের হার ৫২% ছিল। গত এক দশকে গরিব মানুষের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থন ক্রমাগত কমছে। সিএসডিএস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, গরিব মানুষের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থন ছিল ৪৩%, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ছিল ৩৬% ও সর্বশেষ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছিল মাত্র ২৩%। অন্য দিকে তৃণমূলের পক্ষে গরিব মানুষের সমর্থন গত এক দশকে বেড়েছে। ২০০৬ সালে, তৃণমূল গরিবদের মধ্যে সমর্থন পেয়েছিল ২১%, ২০১১ সালে ৩৬%, ২০১৪ সালে ৩৭% ও ২০১৬ সালে ৫২%।

অন্য দিকে ধনীদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থন ২০১১ সালে ছিল ৩৬%, ২০১৪ সালে ছিল ৪২% ও ২০১৬ সালে এখন দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। ধনীদের মধ্যে তৃণমূলের সমর্থন ২০০৬ সালে ছিল ২৫%, ২০১১ সালে ছিল ৪২%, ২০১৪ সালে ছিল ২৯% ও ২০১৬ সালে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। সিএসডিএস এর তথ্য ভিত্তি করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণি যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই ভোটকেন্দ্রিক গণতন্ত্রের একটা জনপ্রিয়তাবাদী (পপুলিস্ট) দিকও আছে যেখানে দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের সমর্থনের সঙ্গে গরিব ও ধনী, দুই ধরনের মানুষের সমর্থন নিয়েই যে কোনও দল ক্ষমতায় আসছে। কিন্তু আমাদের মতো রাজ্যে যেখানে গরিব মানুষের সংখ্যা ধনীদের থেকে অনেক বেশি (পশ্চিমবঙ্গে, ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক আদমসুমারি অনুযায়ী ৮২ শতাংশ পরিবারে সব থেকে বেশি উপার্জন করা ব্যক্তির মাসিক আয় পাঁচ হাজারের কম), তাই গরিব মানুষের ভোট কোন দিকে যায় তার উপর নির্ভর করে নির্বাচনী ফলাফল।

এ বার আসা যাক এই প্রশ্নে যে ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট যদি আলাদা ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত তা হলে কী হত? এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে ভোটের আগে এমন কোনও সমীক্ষার মাধ্যমে। ভোটের কয়েক মাস আগে, এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাজ্যব্যাপী সমীক্ষা করেছিলেন (সমীক্ষার নমুনা ছিল ছাব্বিশ হাজার যা বেশ বড়ো)। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী ২৯৪ বিধানসভা আসনে, কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট যদি আলাদা ভাবে লড়ত এবং রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপিকে নিয়ে চতুর্মুখী লড়াই হত তা হলে কংগ্রেসের মাত্র ১৪টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আর বামফ্রন্টের মাত্র ২১টি আসনে জেতার সম্ভাবনা ছিল। অন্য দিকে তৃণমূল অন্তত ২৫০ আসন পেতে পারত, বিজেপি চারটে (২০১৬ নির্বাচনে আসলে পেয়েছে তিনটে আসন) এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তিনটে আসন পেত যা তারা এই নির্বাচনেও পেয়েছে। অথচ এই সমীক্ষা অনুযায়ী ভোটের শতাংশ হিসেবে তৃণমূল ৪৫% ভোট পেত (আদতে এই নির্বাচনে পেয়েছে ৪৪.৯% ভোট)। অর্থাৎ রাজ্যে মাত্র ৪৫% শতাংশ ভোট নিয়ে শাসক দল আড়াইশো আসন পেত যা বামফ্রন্ট ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে প্রায় ৫২% ভোট নিয়ে পেয়েছিল। এহেন অবস্থা হতে পারত কারণ রাজ্যের প্রধান দুই বিরোধী দলের মধ্যে আসন সমঝোতা না হয়ে বিরোধী ভোট বিভাজিত হত। কিন্তু এ কথা সঠিক যে আলাদা ভাবে লড়লে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট, আসনের বিচারে তৃতীয় স্থানে না থেকে দ্বিতীয় স্থান পেত। তবে বিরোধীদের মধ্যে কোনও দল বা ফ্রন্ট অন্তত ১০% আসন না পেতে পারত, সে ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভায় কোনও বিরোধী দলনেতা নাই থাকতে পারতেন।

> ২০০৬ সালে সিএসডিএস যাদের 'গরিব' মানুষ বলছে তাদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থনের হার ছিল ৫৫%। সিএসডিএস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে গরিব মানুষের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থন ছিল ৪৩%, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে ৩৬% ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছিল মাত্র ২৩%।

২০০৬ বিধানসভায় বামফ্রন্ট ২৩৫ আসন ও ৫০.২% ভোট পেয়েও কেবল দু'বছরের মধ্যে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থন, উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছিল। জেলা পরিষদে ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টি কোনও রকম ধরে রাখতে পারলেও পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বামফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তাই বামফ্রন্টের পতন ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই শুরু হয়েছিল যদিও সেই পতনের চিহ্ন ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, গ্রামের গরিব মানুষের সমর্থন কমে যাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন হয়েছিল তখন কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-১ সরকারকে বামেরা বাইরে থেকে সমর্থন করছিল। অর্থাৎ ২০০৬ সালে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে বামেদের বিপুল জয় আর ২০০৮ সালের পঞ্চায়েতে বামেদের ভরাডুবি শুরু (এই দুটো নির্বাচনী ফল) কিন্তু এমন একটা সময়ে হচ্ছে যখন বামফ্রন্ট আর. কংগ্রেসের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া চলছে। অন্য দিকে ২০০৯ লোকসভা, ২০১১ বিধানসভা, ২০১৪ লোকসভা এবং ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনগুলোয় পশ্চিমবঙ্গে যখন বামেদের নিজস্ব ক্ষমতা ক্রমাগত কমেছে (২০০৬ সালে ৫০.৮% ভোট, ২০০৯ সালে ৪৩.৩%, ২০১১ সালে ৪১.১%, ২০১৪ সালে ২৯.৬% এবং ২০১৬ সালে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে লড়ে ২৫.৬%) তখন কেরালায় বামফ্রন্ট তাদের জনসমর্থন মোটামুটি ধরে রেখেছে। ২০১১ সালে কেরালায়, বামেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মাত্র চারটে আসন কম পেলেও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়েছে।

সেই জন্য কংগ্রেসের হাত ধরলেই বামেদের ক্ষতি হয় এমন যুক্তি দুর্বল। তাই ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভালো ফল করতে পারেনি, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আসন সমঝোতার জন্য নয়। গভীর পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে বামেদের খারাপ ফল হয়েছে গত এক দশকে, তারা বামপন্থী রাজনীতি (কৃষক, ক্ষেতমজুর, সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার নিরলস পরিশ্রমী রাজনীতি) না করার জন্য। অন্য দিকে রাজ্যের শাসক দল চাইবে যে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যাতে বামফ্রন্ট আর কংগ্রেসের মধ্যে কোনও রকম নির্বাচনী জোট না হয়। কারণ বিরোধী শক্তি একত্রিত হলে শাসক দলের পক্ষে নির্বাচনী লড়াই এক দিকে যেমন কঠিন হয় আবার অন্য দিকে ২০১৪ ও ২০১৬ সালের মতো হয় 'একলা চলো' নীতি বা ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৬ সালের নির্বাচনগুলোর মতো বিজেপির হাত ধরা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন ২০০১ সালের ২৮ অগস্ট, এনডিএ সরকারে ফেরার আগে, তৃণমূলনেত্রী, বরিষ্ঠ সাংবাদিক, করন থাপারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজেপিকে 'স্বাভাবিক মিত্র' বলেছিলেন। বাম নেতাদের মতে 'সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট' বিজেপি ও 'স্বৈরাচারী' তৃণমূল কে হটানোর জন্য ২০১৬ সালে বামফ্রন্টের নির্বাচনী কৌশল ছিল উদারনৈতিক কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা। কিন্তু বামফ্রন্ট খেটে খাওয়া মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত রাজনীতি না করলে তারা কি আর বামপন্থী থাকে? তারা বরং আরেকটা উদারবাদী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় যারা পার্টির দলিলে নব-উদারবাদের বিরুদ্ধে লড়ার কথা বললেও অনেক সময়, কাজেকর্মে নব-উদারবাদকে মেনে নেয়। তর্কের খাতিরে যদি বলা যায় যে রাজ্যের অনেক মানুষ গণতন্ত্রের প্রশ্নে তৃণমূল বিরোধী একটা উদারনৈতিক দলকে ভোট দেবে তাহলে সেটা কংগ্রেসের মতো ১৩১ বছরের পুরানো লিবারাল দলের চেয়ে বামফ্রন্টের মতো 'মেকি লিবারাল'-দের কেন ভোট দেবে? তাই সিপিআইএম পরিচালিত বামফ্রন্ট-এর লিবারাল ও নিওলিবারাল লাইন ছেড়ে বামপন্থী রাজনীতি করা উচিত।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক